কার ইবাদত করব, কেন করব?

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ নূরুল্লাহ তারীফ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

مَنْ أَعْبُدُ ولماذا أعبد؟

« باللغة البنغالية »

محمد نور الله تعريف

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

কার ইবাদত করব, কেন করব?

এ মহাবিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু প্রাণীজগতের মধ্যে কেবল মানুষেরই বিবেক রয়েছে, ভালমন্দ - বিবেচনা করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই জীবন সংসারের পরতে পরতে মানুষকে তার সুকীর্তির জন্য পুরস্কৃত করা হয়, আবার দুষ্কৃতির জন্য তিরস্কার করা হয়। মানুষ তার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তার চেয়ে অধিক শক্তিধর, অতি হিংস্র, অত্যন্ত বিষধর, বিশালদেহী প্রাণীকে পর্যন্ত বশ করতে সক্ষম হয়। অনেক সময় দেখা যায় বিশালাকায় হাতীটির মাহুত ছোট্ট একটি মনুষ্য বাচ্চা অথবা শক্তিশালী অশ্বের সওয়ারী একজন নাবালক শিশু। জলে-স্থলে এমন কোনো প্রাণী নেই মানুষ যাকে বশ করতে পারেনি। বড় তিমি মাছটিকেও মানুষের কাছে হার মানতে হয়েছে।

কিন্তু, এ বুদ্ধিমান মানুষ যার কাছে প্রাণীজগতের সকলেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নতি স্বীকার করে, সেকি অন্য কোনো শক্তিমানের কাছে নত হতে বাধ্য? অন্য কোনো সত্তার কাছে আপনাকে সঁপে দেয়ার কোনো আবশ্যকতা কি মানবের রয়েছে? অন্য কথায় মানুষের

জীবনে উপাসনা বা ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? আদৌ কি মানুষ কারো কাছে মাথা নত করতে বাধ্য? নাকি এসব ধর্মান্ধদের গোঁড়ামি বৈ কিছুই নয়। আসুন অন্তরের জানালাকে উন্মুক্ত রেখে, দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, বিবেককে কাজে লাগিয়ে এটু ভাবি।-ক-

প্রথমেই আসা যাক, এ মহাবিশ্ব সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে। এ সম্পর্কে যদি আমরা নানা জনের নানা কথা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই সম্ভবতঃ কোনো কূলকিনারা পাব না। তবে এ সংক্রান্ত মৌলিক মত কিন্তু দুইটি। একএ বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন :, তিনি এ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। দুইএ : বিশ্বজগতের কোনো স্রষ্টা নেই, অন্য কোনো উপায়ে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ জগত পরিচালিত হচ্ছে, এর নিয়ন্ত্রণে কারো হাত নেই। এ দুটো ছাড়া আরো যেসব মতামত রয়েছে সেগুলো এ মতদ্বয়ের শাখা মত বা সম্প্রসারিত মতামত। আমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বলতে পারি এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ প্রথম মতের প্রবক্তা। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী। আর ধর্মসমূহের মূলকথা হল স্রষ্টার উপাসনা করা। তা একক সত্তার জন্য হোক অথবা

একাধিক সত্তার জন্য হোক। সুতরাং স্রষ্টার জন্য উপাসনা সাব্যস্ত করার আগে তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকেও সাব্যস্ত করবে এটাই - যৌক্তিক। আর দ্বিতীয় মতের পক্ষে রয়েছেন অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক মানুষ। তাদের মধ্যে নব্য মতবাদসমূহের প্রবক্তাদের বক্তব্য এ ব্যাপারে অতি স্পষ্ট এবং মতের উপর তাদের অবস্থানও অতি মজবুত। যেমন, প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদ (positivism) যার প্রবক্তা হচ্ছেন ফরাসি দার্শনিক ও ওগ্যস্ত কঁৎ; মানবতাবাদ বা মানবতন্ত্রবাদ (humanism) যার প্রবক্তা হচ্ছেন জন ডেভিড; কমিউনিজম (communism) যার প্রবক্তা হচ্ছেন কার্ল মার্কস ইত্যাদি নব্য দার্শনিক থিওরীর প্রবক্তারা।

এবার আসা যাক সুস্থ বিবেক কি বলে? উপরিউক্ত দুটো মতের কোনটির পক্ষে একজন সুস্থ মানুষের বিবেক সায় দেয়?

যারা দ্বিতীয় মতের প্রবক্তা তাদের মধ্যে কেউ হলেন প্রকৃতিতে বিশ্বাসী। তারা বলেন, এই মহাবিশ্ব প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি। পদার্থের বিভিন্ন অংশের মাঝে বিক্রিয়ার ফলে কোনো ধরনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছাড়া তার বিভিন্ন অংশগুলো একটি নির্দিষ্ট অবয়ব ও নির্দিষ্ট পরিমাণে জড়ো হয়ে আসমান, জমিন, মানুষ ও

উদ্ভিদ ইত্যাদির অস্তিত্ব হয়। বিক্রিয়ার কারণে পদার্থের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের আকৃতি ধারণ করে যার ফলে মহাবিশ্বের প্রাণীজগত ও জড়জগতের মাঝে শ্রেণী বৈচিত্র প্রচুর।

আমরা যদি এ মতাবলম্বীদেরকে জিজ্ঞেস করিআপনারা প্রকৃতি - বলতে কি বুঝাতে চান। তারা হয়তো বলবেনপ্রকৃতি হচ্ছে এ - জগতের অস্তিত্বশীল বিভিন্ন সত্তা; যেমনপ্রাণিজগত -, উদ্ভিদজগত, জড়জগত। অথবা বলবেন প্রকৃতি হচ্ছে এ মহাবিশ্বে বিদ্যমান বিভিন্ন বস্তুর নানা রকম বৈশিষ্ট্য বা গুণ; যেমন, উষ্ণতা ও ঠাণ্ডা, গতিময়তা ও জড়তা, কাঠিন্য ও তারল্য ইত্যাদি। তৃতীয় কোনো জবাব তারা আদৌ দিতে পারবে না। উত্তর তাদের যেটাই হোক না কেনকিভাবে ভাবা যেতে পারে কোন -ো বিবেকহীন সত্তা বিবেকবান কোনো সত্তাকে অস্তিত্ব দিবে?! মানুষ বিবেকবান প্রাণী, তার রয়েছে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি, লক্ষ্যউদ্দেশ্য-, অন্যকে পরিচালনা করার ক্ষমতা। সুতরাং যার নিজের কোন (প্রকৃতি)ো ইচ্ছাশক্তি নেই তার পক্ষে কি সম্ভব এমন কাউকে সৃষ্টি করা যার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, যার কার্যাবলী বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সাধিত হয়?! অথবা প্রকৃতির পক্ষে কি সম্ভব এ বিশাল জগতকে এত

নিপুনভাবে পরিচালনা করা, যে নিপুনতার প্রমাণ আমরা আমাদের চারিপাশের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে লক্ষ্য করি?!

তাছাড়া পদার্থের অংশগুলোর তো নিজস্ব কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই; সে কিভাবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, প্রাণীজগত, উদ্ভিদজগত, মানুষ ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে মহাবিশ্বে বৈচিত্র আনল?!

যে পদার্থের নিজেরই বিবেক নেই, দৃষ্টিশক্তি নেই সে কিভাবে এ পৃথিবীর বস্তুগুলোকে বিন্যস্ত করবে, স্তরে স্তরে সাজাবে?! যে পদার্থের কথা বলার ক্ষমতা নেই সে কিভাবে বিভিন্ন বস্তুর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবে, ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার পরিকল্পনা করবে?!

বরঞ্চ প্রকৃতিবাদীদের এ মতামতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পানি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে, পৃথিবী নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে, আসমান নিজেই আসমানকে সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন বস্তু নিজেই নিজেকে অস্তিত্ব দিয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। অর্থাৎ যে সৃষ্টি সেই আবার স্রষ্টা। এটা অসম্ভব, অযৌক্তিক**। এর ফলে বিপরীত ধর্মের দুই সত্তা মিলিত**

হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথবা তাদের এ মতামতের আউট ফুট হল কোনো কারণ ছাড়া যে কোনো কিছুর অস্তিত্ব হওয়া সম্ভব; যা নিতান্ত ভ্রান্ত কথা। যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এ মতের প্রতিবাদ করবেন। কারণ এ পৃথিবীর দালানকোঠা-, বাড়ীগাড়ী-, আসবাবপত্র ইত্যাদি সবকিছু কোনো না কোনো মাধ্যমকে আশ্রয় করে তৈরী হয়েছে। মাধ্যম ছাড়া কোনোটাই অস্তিত্ব লাভ করেনি। সুতরাং এ মহাবিশ্ব কিভাবে কোনো মাধ্যম ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করবে!?

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের মধ্যে কেউ আবার বিজ্ঞানীদের গোঁড়া অনুসারী, যারা পরীক্ষাগারে নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণার পর কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবং মত পেশ করেন। বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ অন্যের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু সময়ের জন্য নাস্তিক্যবাদের প্রতি নতজানু হলেও যখনি তারা নিজের সামনে মুক্ত চিন্তার দ্বার উম্মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন তখনি তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এ পৃথিবীর একজন স্রষ্টা আছেন। এ রকম একজন বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে ফ্রাঙ্ক লেন। যিনি বায়োলোজির গবেষক ছিলেন। তিনি বলেন, "যদি আমরা মেনে

নিই এ জগত অস্তিত্বশীল, তবে এ অস্তিত্ব ও এর উৎসকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এ প্রশ্নের উত্তরের চারটি সম্ভাবনা থাকতে পারে।

এক: হয়ত বলা হবে এ মহাবিশ্ব কল্পনা ছাড়া আর কিছু না। এ মতামত আমরা শুরুতে যা মেনে নিয়েছি তার সাথে সাংঘর্ষিক- অর্থাৎ এ মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল।

দুইঅথবা বলা হবে এ মহাবিশ্ব নিজে থেকেই নিজে সৃষ্টি : হয়েছে। সহজজ্ঞান (intuition) এ মতকে প্রত্যাখান করে।

তিন অথবা বলা হবে :এ মহাবিশ্ব অনাদি, যার কোনো শুরু নাই। এ মত আল্লাহতে বিশ্বাসীদের মতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা বলেন সৃষ্টিকর্তা অনাদি। কিন্তু মহাবিশ্বের নিয়মনীতি এটাই প্রমাণ করে যেএ মহাবিশ্ব একটা সময়ের সাথে জড়িত এবং নির্দিষ্ট একটা - ক্ষণ থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। সুতরাং এ মহাবিশ্ব একটা ঘটনার ফল বটে, কিন্তু এ সুনিপুন, বিন্যস্ত ঘটনাকে কোনো দৈব ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। অতএব এ মতও বাতিল।

চারঅথবা বলা হবে এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি : অনাদি, তিনি এ মহাবিশ্বকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, এর আগে মহাবিশ্বের কিছুই ছিল না। কোনোরূপ আপত্তি না করে বিবেক এ মতটাকে গ্রহণ করে এবং এ মতকে গ্রহণ করার ফলে ভিন্ন কোনো সম্ভাবনার অবতারনা হয় না, যা এ মতকে অসার প্রমাণিত করতে পারে। সুতরাং এ মতের উপর নির্ভর করা অপরিহার্য।”

জন ক্লিফল্যান্ড কার্সার নামে অপর এক গণিতবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী বলেন, “পদার্থ বিজ্ঞান আমাদেরকে যে প্রমাণ দিচ্ছে তা হচ্ছেকিছু কিছু পদার্থ ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে। কিন্তু এর - কোনোটি খুব দ্রুত এগুচ্ছে, আবার কোনোটি খুব ধীরে এগুচ্ছে। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে ‘পদার্থ চিরস্থায়ী নয়’, সুতরাং পদার্থ অনাদিও নয়। পদার্থ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সূত্রগুলো এ প্রমাণ দেয় যে, পদার্থের শুরুটা খুব দ্রুত ছিল না, আবার ক্রমধারায়ও ছিল না। বরং হঠাৎ করে পদার্থের উৎপত্তি হয়। এমনকি বিজ্ঞান আমাদেরকে পদার্থের সঠিক উৎপত্তি কালটাও বের করে দিতে সক্ষম। এর উপর নির্ভর করে বলা যায় বস্তুজগৎ সৃষ্ট এবং সৃষ্টির পর থেকে তা বিশেষ নিয়ম ও বিশেষ ধর্ম মেনে

চলছে। দৈবক্রমে এর সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এ বস্তুজগৎ যখন নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারেনি এবং নিজস্ব গতিপথ ও আপনার ধর্ম নিজে নির্ধারণ করতে অক্ষম, সুতরাং তা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার গুণে গুণান্বিত কোনো এক মহান সত্তার কুদরতে সৃষ্টি।"

উপরিউক্ত যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথম মতই সঠিক। অর্থাৎ এ মহাবিশ্ব মহান স্রষ্টার সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এ মহাবিশ্ব তাঁর আদেশে সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং তাঁর ইশারায় ধ্বংস হবে। সুতরাং এ মহাবিশ্বের অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও সে মহান স্রষ্টার একটা সৃষ্টি এবং তাঁর নিময়নীতির কাছে নত হতে বাধ্য; চাই তা ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক। তার সাথে সাথে এ কথাও প্রমাণিত হয়, মহান স্রষ্টা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভুষিত এবং তাঁর জ্ঞান সৃষ্টিকুলের জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। সৃষ্টিকুল তাঁর জ্ঞান সীমানায় পৌঁছার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। সৃষ্টির আয়ু, ক্ষয়, ধ্বংসের নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র তাঁর কাছে রয়েছে।

স্রষ্টার অস্তিত্বের উপর নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসার পর আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছেস্রষ্টা কি একজন না এ -কাধিক? এই প্রসঙ্গে আমাদেরকে খুব বেশী আলোকপাত করতে হবে বলে মনে করি না। কারণ এটা খুব স্পষ্ট বিষয়। যদি ধরে নিইএ পৃথিবীর - স্রষ্টা একজন নয়, একাধিক তবে আমাদেরকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেতাদের কে আগে কে পরে -? কে কার চেয়ে শক্তিশালী? কার নির্দেশে মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে? অথচ পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, স্রষ্টা অনাদি, কালের বন্ধনে তাঁর অস্তিত্বকে আবদ্ধ করা থেকে তিনি পবিত্র; বরং কাল বা সময় তাঁর সৃষ্টিকুলের অন্তর্ভুক্ত। কালের অস্তিত্বের আগে অতীতভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। আর স্রষ্টা যদি -বর্তমান- একাধিক হন এবং তাদের শক্তিও সমমানের হয় তাহলে এ মহাবিশ্ব পরিচালনায় বিঘ্ন দেখা দেয়া স্বাভাবিক ছিল; অথচ এ ধরনের কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি দেখা দেয়নি। অর্থাৎ মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ যদি দুজনের হাতে থাকত তাহলে একজন বলতেনআজ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত - হবে; অন্যজন বলতেননা -, আজ সূর্য পূর্ব দিক থেকেই উদিত হবে। এভাবে মহাবিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ত। কিন্তু এমন

কিছু আজো ঘটেনি। যদি বলি না তারা একজন অন্যজনের -
চেয়ে শক্তিশালী অথবা বলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুজনের অংশগ্রহণ
থাকলেও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দুজনের অংশগ্রহণনেই; তাহলে
দুজনের একজনকে ব্যর্থতার গুণে গুণান্বিত করা হল যা স্রষ্টার
শানে সাজে না। স্রষ্টা হবেন তিনি যিনি যাবতীয় পূর্ণতার গুণে
ভূষিত; সকল ব্যর্থতা, হীনতা ও দীনতার যিনি উর্ধ্বে।

এমনকি এ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যারা
একাধিক উপাস্যের উপাসক তারাও এ কথা বলেন না যে, স্রষ্টা
একাধিক। তারা মনে করেন উপাসনা পাওয়ার যোগ্য সত্তা
একাধিক, কিন্তু মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন একাধিক সত্তা এ কথা
তারাও বলেন না। খ্রিস্টানদের কথাই ধরা যাক না; তারা
ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসীঅর্থাৎ তারা পিতা -, পুত্র ও পবিত্র আত্মার
উপাসকতার -াও এ কথা মনে করেন না যে এ তিনজনে মিলে
মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। বরং তারাও বলেন মহাবিশ্বের স্রষ্টা
একমাত্র পিতা। আর যীশূ তাঁর পুত্র হিসেবে (তাদের দৃষ্টিতে)
উপাসনা পাওয়ার যোগ্য এবং পবিত্র আত্মা যেহেতু এ দু'জনের
মাঝে বার্তাবাহক ছিলেন, সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে তিনিও উপাসনা

পাওয়ার যোগ্য। অথবা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কথা বিবেচনা করলেও দেখা যায়, তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও সবাইকে তারা স্রষ্টা মনে করেন না। বরং একজনকেই তারা স্রষ্টা মনে করেন।

অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা একজন এবং মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর সাথে অন্য কোনো সত্তার অংশগ্রহণ ছিল না, তাঁর একক নির্দেশে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

এখন আমাদের এ সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন মানুষ কি তার স্রষ্টার প্রতি নতি স্বীকার করতে বাধ্য? মানুষকে কি তাঁর উপাসনা করতে হবে?

স্রষ্টার প্রতি নতি স্বীকার বা বশ্যতা স্বীকার দু রকম হতে পারে। একইচ্ছাধীন নতি স্বীকার। :অনিচ্ছাধীন নতি স্বীকার। দুই :

অনিচ্ছাধীন নতি স্বীকার হচ্ছে এমন যাতে সৃষ্টিকুলের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো প্রভাব নেই। অর্থাৎ ঐসব নিয়ম বা বিধি-বিধানের প্রতি নতি স্বীকার করা যেগুলো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লঙ্ঘন করারসাধ্য এ মহাবিশ্বের কারো নাই; হোক মানুষ অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি। যেমনরাতদিনের আবর্তন -, জন্মমৃত্যুর -

বিধিবদ্ধ রীতি, চন্দ্রঅস্ত-সূর্যের উদয়-, জোয়ারভাটার আবহমানতা - " ইত্যাদি। এমন কি বিবেকের অধিকারী প্রাণীমানুষ" পর্যন্ত তার নিজের দেহের ক্ষেত্রে স্রষ্টার নিয়ম মানতে বাধ্য। মানুষের হৃদপিণ্ড, শিরাউপশিরা-, কিডনী অথবা অন্য যে কোন অঙ্গ ঠিক সেভাবে কাজ করে চলছে যে ফর্মুলা স্রষ্টা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি নির্দেশ দিয়ে, জোর খাটিয়ে এগুলোর গতিপথ পরিবর্তন করতে অক্ষম। অতএব প্রথম প্রকারের নতি স্বীকার করতে সৃষ্টিকুলের সবাই বাধ্য। চাই সে মানুষ হোক অথবা অন্য কোনো প্রাণী হোক অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি হোক।

আর ইচ্ছাধীন নতি স্বীকার হচ্ছেযা করতে স্রষ্টা কাউকে বাধ্য - করেননি। যার ইচ্ছা সে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, তার কাছে নত হয়। আর যার ইচ্ছা সে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে না, তাঁকে মানে না। এ প্রকারের নতি স্বীকারকে ধর্মাবলম্বীরা "ইবাদত", 'উপাসনা' "পূজা" ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু বিবেক কী বলে? বিবেক কি স্রষ্টার উপাসনা করাকে আবশ্যক সাব্যস্ত করে? ন্যায়ের দাবী কি স্রষ্টার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা? আসুন এ বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করি।

একএ পৃথিবীতে যদি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনগুলোর দিকে : -দৃষ্টিপাত করা হয় তবে দেখা যাবে সবগুলো প্রয়োজন বা চাওয়া পাওয়া দুটো বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো কল্যাণ লাভ করা এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান; হাসি-খুশি, নিরাপত্তা, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদি সব কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত**। আর রোগ**, শোক, যুদ্ধবিগ্রহ-; কান্না, ব্যথাবেদনা ইত্যাদি সব - অকল্যাণেরঅন্তর্ভুক্ত**। যেহেতু মহান স্রষ্টা কল্যাণ ও অকল্যাণেরও স্রষ্টা এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের ভাগ**-বাটোয়ারা তাঁর হাতে। এ মহাবিশ্বে এমন কোনো সত্তা নেই যিনি কল্যাণ আনয়নে, অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে সার্বক্ষণিক মানুষের পাশে থাকতে পারে; একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া। অতএব মানুষের উচিত কল্যাণ পাওয়ার জন্য, অকল্যাণকে প্রতিহত করার জন্য স্রষ্টার প্রিয়ভাজন হওয়া, সার্বক্ষণিক ও সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। আর একেই বলে স্রষ্টার ইবাদত, উপাসনা, পূজা বা দাসত্ব। অতএব মানুষের নিজের স্বার্থে স্রষ্টার উপাসনা করা তার উপর আবশ্যকীয়।

দুইসৃষ্টিকুলের জ্ঞান স্রষ্টার জ্ঞানের সামান্যতম অংশমাত্র। মানুষ : অতীত জীবন ভুলে যায়, বর্তমান সম্পর্কে সামান্যটুকু জ্ঞান রাখে, আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাছাড়া মানুষ যতটুকু জ্ঞান রাখে তাও স্রষ্টাপ্রদত্ত। কিন্তু স্রষ্টার জ্ঞান সর্বব্যাপী, তিনি প্রতিটি অণুপরমাণুর অতীত-, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন। কোন ফর্মুলা মানব জীবনের জন্য উপযোগী, কোন ফর্মুলায় মানব জীবনের সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান মিলবে এ জ্ঞান একমাত্র স্রষ্টার রয়েছে। অতএব মানুষের উচিত স্রষ্টার দেয়া বিধিবিধান মেনে চলা। তাঁর আদেশ পালন করা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা; এটাই স্রষ্টার উপাসনা।

তিনযে কোন :ো ভাল গুণের প্রতি মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দূর্বল। ভাল গুণের অধিকারীকে সবাই ভালোবাসে। ক্লাশের ভাল ছাত্রকে, মেধাবী ছেলেটিকে সবাই বন্ধু হিসেবে পেতে চায়। আর এ ভালগুণগুলোর যিনি স্রষ্টা তাঁর মাঝে এ গুণগুলো পূর্ণামাত্রায় বিদ্যমান আছে বলেই তো ঐসব গুণের কিঞ্চিত মাত্রা তিনি সৃষ্টিকে দিতে পেরেছেন। অতএব মানব প্রকৃতির দাবী স্রষ্টাকে ভালোবাসা, আর স্রষ্টাকে ভালোবাসাই হল উপাসনার মূল কথা।

যেহেতু উপাসনা বলতে বুঝায় "পূর্ণ ভালোবাসার সাথে পরিপূর্ণ নতি স্বীকার করা।" অতএব মানুষের সহজাত প্রকৃতির দাবী স্রষ্টার উপাসনা করা। যেহেতু তিনি সৃষ্টির চেয়ে উত্তম এবং তিনি যাবতীয় উত্তম গুণাবলীতে অভিষিক্ত।

প্রবন্ধকে আর দীর্ঘায়িত না করার স্বার্থে এ প্রমাণগুলোকে আমরা যথেষ্ট মনে করছি এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম যে মানুষের উপর স্রষ্টার উপাসনা করা আবশ্যক; তা তার নিজের স্বার্থেই, নিজ প্রয়োজনে; স্রষ্টার এতে কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই। তাহলে এবার এ সিদ্ধান্তে আসা উচিত স্রষ্টার সাথে কি অন্য কারো উপাসনা করা যাবে, নাকি এককভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে?

পূর্বের আলোচনাতে আমরা যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণে স্রষ্টার উপাসনা করার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছি সে সকল গুণাবলী যেমনসৃষ্টি করার ক্ষমতা -, এ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ, নিখুঁত-জ্ঞান, ভালদমনের ক্ষমতা একমা-আনয়ন ও মন্দ-ত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কারো কাছে নেই। অতএব উপাসনা পাওয়ার নিরঙ্কুশ অধিকার স্রষ্টার একার। অন্য কেউ এ অধিকারে তার সাথে

অংশীদার নয়। বরং স্রষ্টা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন -“তোমাদের উপাস্য একজন, তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাসনা পাওয়ার হকদার নয়।” [১৬৩ :বাকারাহ-সূরা আল] এবং যেহেতু তিনি ব্যতীত এ মহাবিশ্বের আর সবকিছু তাঁর সৃষ্টি, তাঁর অনুগত দাস; অতএব মনিবকে বাদ দিয়ে এক দাস আরেক দাসের প্রতি নতি স্বীকার কি আদৌ যুক্তিসঙ্গত? আমরা যে সূর্য দেখতে পাচ্ছি সে তো তার স্রষ্টার নির্দেশে আলো দিয়ে যাচ্ছে। যে বিশাল সমুদ্র দেখছি সে তো তার সৃষ্টিকর্তার আদেশে বহমান। যে বিশাল আকাশ দেখছি তাও তো তাঁর স্রষ্টার কুদরতে দাঁড়িয়ে আছে। অতএব এদের পুজাঅর্চনা করা কি আদৌ যৌক্তিক।-

যে যীশুর পুজা করা হয় তিনি তো মানব। আর মানব কি মহান স্রষ্টার সৃষ্টি নয়তাহলে সৃষ্টিকে কিভাবে স্রষ্টার ! প্রাপ্য অধিকার দেয়া হবে। যে ‘পবিত্র আত্মার’ (জিব্রাইলেরপূজা করা হয় সেও (তো এ মহাবিশ্বের একটা একক। তাহলে সে ও তো স্রষ্টার সৃষ্টি। অতএব কিভাবে তাকে স্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে তাঁর প্রতি নতি স্বীকার !কি অজ্ঞতা নয়-করা হবে। তা

আর মাটির তৈরী পুতুল দেবতা; তার তো না আছে প্রাণ, না আছে শ্রবণশক্তি, না আছে দৃষ্টিশক্তি। নিজের রক্ষণাবেক্ষণ সে নিজে করতে পারে না। তাহলে সে কিভাবে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তির অধিকারী বিবেকবান মানবের উপাস্য হবে। তার নিজের দেহকে প্রতিনিয়ত ধুয়ে মুছে রাখার জন্য সে অন্যের মুখাপেক্ষী। তাহলে সে কিভাবে মানুষের অকল্যাণ দূর করবে!

এ নিরিখে আমরা বলতে পারি মহান আল্লাহ এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত আর যা কিছুর উপাসনা করা হয় না কেন তারা বা সেগুলো প্রত্যেকটি এ মহাবিশ্বের একেকটা একক বা একেকটা অংশ। আর মহাবিশ্বের সবকিছু যেহেতু আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সুতরাং এসব কল্পিত উপাস্যরাও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। অতএব মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে এসব উপাস্যের উপাসনা করা মানে স্রষ্টার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা, সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে সমাসীন করানো। নিঃসন্দেহে এটা মহা অন্যায়, অমার্জনীয় অপরাধ।

অতএব হে মানব; নাস্তিক্যবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ ছেড়ে দিয়ে একত্ববাদ গ্রহণ কর। এক আল্লাহর ইবাদতের স্বীকৃতি দাও। তাওহীদের শাহাদা দিয়ে মুমিন হও। তবে তুমি কল্যাণে অভিষিক্ত

হবে। দুনিয়াতে শান্তি পাবে, পরকালে তোমার মুক্তি মিলবে। আল্লাহ তোমার ভাল করুন।